সীমান্ত কথা - ৫

মখদুম আজম মাশরাফী

গত সংখ্যার পর - - - -

মানুষ দেশ ছেড়ে যায় অনেক বড় দুঃখ বুকে নিয়ে। সে অনুভুতির দুঃসময় আমার কখনও হয়নি। তাই হয়তো তা কোনদিনও তাদের মত করে অনুধাবন করতে পারবো না। কিন্তু যারা এই দুঃখ নিয়ে বেঁচে আছে তাদের মুখাবয়বের গভীরে যে মুখ, সে মুখের অভিব্যক্তিতে আর মনের ভেতরের যে গভীর মনোভূমি, তার ভেতরে নিবিড় করে দেখলে সে কান্নার অশ্রু, সে দুঃখের পাষানভার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বেদনা তখন সঞ্চারিত হয় আমার বুকেও।

বুড়িদিদিমনি ছিলেন প্রাইমারী স্কুলে আমাদের শিক্ষিকা। শুভ্র বসনে তার বিধবা জীবনকে মুড়ে কতকাল থেকে তিনি শিক্ষকতা করছেন তা জানি না। তিনি চশমার বাক্স হাতে ক্লাশঘরে আমাদের শাসনে-সোহাগে শিক্ষা দিতেন। মনে আছে তিনি ছিলেন বেশ কড়া প্রকৃতির। দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে তিনি সেই চশমার বাক্সটি দিয়ে আমাদের বাড়ি দিতেন। সেকালে স্কুলে বেত্রাঘাতের প্রচলন ছিল। কিন্তু তিনি কখনও তা ব্যবহার করেননি। তিনি প্রায়ই পান চিবোতেন । তাই ঠোঁট লাল হয়ে থাকতো সর্বক্ষন। তার স্নেহপ্রবন মনটির কোন প্রকাশ তেমন ছিল না। কিন্তু আমাদের শিশু জীবনের প্রতি অপরিসীম দায়িত্ববোধখানি সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতো।স্কুলে আমরা ক্লাসে একদিন তার জন্যে অপেক্ষা করছি। পরে অন্য একজন শিক্ষিকা এলেন ক্লাস নিতে। তার মুখে শুনলাম দিদিমনি চলে গেছেন ডোমার ছেড়ে ইন্ডিয়ায়। বুকটা কেমন যেন শুন্যতায় ভরে উঠল। দিদিমনির মুখটা ভেসে উঠল বার বার। ক্ষীন একটা ব্যথার বোধ সেই ছোট মনগুলিকে শ্রাবন মেঘের মত আচ্ছন্ন করে ফেলল ধীরে ধীরে। দিদিমনিকে জীবনে আর কোনদিন দেখবো না ভেবে মনটা হাহাকার করে উঠেছিল।এভাবে কাউকে না জানিয়ে সম্পূর্ণ গোপনে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি আবাস জন্মভুমি, পরিচিতজনকে ছেড়ে চলে যেতে নিশ্চই ওঁর প্রাণ হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। তিনি কোন অপরাধবোধে তাড়িত হয়ে এরকমটি করেছিলেন তা কোনদিনও বুঝা হয়ে ওঠেনি আমার।

শিবানী দিদিমনি ছিলেন খুবই স্নেহশীলা সবার প্রিয় প্রিয়দর্শিনী শিক্ষিকা। সৌম্য, কোমল মুখায়ব, অনতিদীর্ঘ দেহ। কোকড়ানো চুলে বেনীবাঁধা, কুমারী শরীরে সুন্দর করে শাড়ি পরা দিদিমনি কোনদিন আমাদের রাগ করে কথা বলেন নি। আদরে-স্নেহে আমাদের শিক্ষামুখী করে তুলতেন তিনি। একদিন তিনিও ক্লাসে আর ফিরে এলেন না। বুড়ি দিদিমনির মত একরাতে তিনিও হারিয়ে গেলেন সীমান্তের ওপারে। এভাবেই চলে গেল আমার খেলার সাথীরাও। প্রবাল, দেবযানী, ছিল শিবানী দিদিমনির ছোট ভাইবোন, আমার সহপাঠি আর খেলার সাথী। আরও যে খেলার সাথীরা চলে গিয়েছিল তারা হল অতুল ও গৌতম। এদের জন্যে অনেক কষ্ট হত ভেবে যে এদের সাথে আর কখনও দেখা হবে না।

এভাবে দেশ ছাড়ার ধারা পাকিস্তানী আমলে যেভাবে ছিল বাংলাদেশ হয়েও তা বন্ধ হয়নি। রংপুর মেডিকেল কলেজে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ছিল প্রাণবন্ত পরিবেশ। কলেজের বাইরে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর শহরের সাহিত্য জগৎ, কারমাইকেল কলেজেও ছিল খুবই জমকালো চর্চা। মেডিকেল কলেজে আমরা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন করতাম, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হত সপ্তাহ ব্যপি, নিয়মিত নানান সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হত। মনে আছে আমরা মঞ্চস্থ

করেছিলাম 'নীলদর্পন', 'বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন', 'বাবাবদল' ধরনের নাটক। নীল দর্পনে আমি ক্যাপ্টেন রোগের চরিত্রে আর বাবাবদলে আমি বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। আমাদের নাটকে যারা কলাকুশলী তাদের মধ্যে হরিরাম আগরওয়ালা ছিলেন অন্যতম। তিনি আমার সিনিয়র ছিলেন।তার স্ত্রী রাজশাহী মেডিকেলে পড়াশুনা করতেন। ডাক্তার হয়ে ইন্টার্নশীপ শেষ করার পর হরিদা জানলাম দেশ ছেড়ে সস্ত্রীক পাড়ি জমিয়েছেন সীমান্তের ওপারে। শৈশব কালের সেই পুরোনো ব্যাথাটিকে উস্কে দিয়ে হরিদার চলে যাওয়া আজও বুকে বেদনার অক্ষয় চিহ্ন হয়ে আছে।

এখানেই শেষ নয়। আমাদের এনাটমীর লেকচারার ছিলেন রঞ্জন সাহা। তিনি ডিসেকশন ডেমোনেষ্ট্রশন দিতেন লাশ ব্যবচ্ছেদ ল্যাবে। আমাদের প্রিয় ছিলেন, ছিলেন নম্র স্বভাবী এবং বন্ধুবৎসল। শিক্ষকতার সাথে বন্ধুত্ব বাংলাদেশে আছে তবে খুব স্বল্প যা তার মধ্যে ছিল। তিনিও একদিন না জানিয়ে পাড়ি দিলেন সীমান্তের ওপারে। হারিয়ে গেলেন আমাদের জীবনের ছক থেকে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। এই প্রস্থান, এই পলায়ন, এই আজীবন গড়ে তোলা খেলাঘর অকস্মাৎ অন্ধকারে গুড়িয়ে দিয়ে অজানা আলোয় দেশে যাওয়া যে কি কষ্টের তা জানা হয়নি কখনও। কিন্তু যাদের ছেড়ে তারা চুপিসারে চলে যায়, তাদের বুকের মধ্যে রেখে যাওয়া শূন্যতা, ক্ষত ভরে না, শুকোয় না কোন দিন তারা কি তা জানে?

আমার সহপাঠি পুরুষোত্তম আগরওয়ালা ছিল আমার সহৃদয় বন্ধু। পুরুষোত্তমের মধ্যে দেখেছি এদেশের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত অবস্থান। ওর বাড়ী দিনাজপুরের রুহিয়ায়। ওর আত্মীয় স্বজন আছে ওপার বাংলায়, বিহারে, নেপালে। যেমন আমার আছে ওপার বাংলায় ঐতিহাসিক কারনে। কিন্তু পুরুষোত্তমের মনের কোথাও কখনও আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন নেতিবাচকতা দেখিনি অথবা ভারত সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারনা বা আকর্ষনবোধ লক্ষ্য করিনি। আমরা দুবন্ধু ভ্রমন করেছি নেপাল, বিহার ও পশ্চিম বাংলার শিলিগুড়ি ও কলকাতা। প্রায় সময়ই আমি ওর আত্মীয়ের বাসায় থেকেছি আপনজনের মত করে। সে এক অপূর্ব অনুভুতি, অভিজ্ঞতা তা বলবো আরেক দিন।পুরুষোত্তমের কাছে জানলাম, হরিদা কলকাতায়। দুবন্ধু যখন কলকাতায় যাই তখন গিয়েছিলাম হরিদার বাসায় তার সাথে দেখা করতে। তিনি সস্ত্রীক কালিঘাটের কাছে একটি জরাজীর্ণ ও প্রাচীন ইউনিটে থাকেন। পানির কষ্ট, আলোবাতাসের স্বল্পতা, অপরিষ্কার, অপরিসর এই ইউনিটে তারা সংগ্রাম করে চলেছেন 'ঘটি' জীবনের। কলকাতাবাসীরা বাংলাদেশ থেকে আগত জনদের 'বাঙ্গাল' নতুবা 'ঘটি' বলে সম্বোধন করে থাকে। হরিদা ও মীরাবাঈ বৌদি আমাদের দেখে সলজ্জ কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিক আপ্যায়ন করলেন। বাংলাদেশের সেই উষ্ণ অতিথীপরায়নতার ম্লান শিখা ওদের মধ্যে আমরা এসে যেন উস্কে দিলাম সহসা। ক্ষণিকের জন্যে হলেও ওরা হয়ে উঠলেন মননে উজ্জ্বল আর সুখি। তাদের ফেলে আসা সুখময় সময়ের স্মৃতি আর একদা পরিচিত স্বজনের সান্নিধ্য তাদের ক্ষণকালের জন্যে হলেও ভুলিয়ে দিল এখানকার কঠোর জীবনের কষ্টগুলি। তারা নানা ভাবে দুঃখ করে বললেন, কিভাবে তারা পুরোপুরি অপাংতেয় এখানে। কি ভাবে নানা ভাবে অবহেলিত হয়ে আছেন। বাংলাদেশ থেকে ওভাবে না জানিয়ে চুপিসারে আসায় ওরা কতখানি লজ্জিত। আর এভাবে ওরা ফিরে যাওয়ার পথটিও বন্ধ করে ফেলেছেন। এটা যে কতখানি ভুল পদক্ষেপ তা ভেবে তারা অনুশোচিত। পরে অন্যবার যখন হরিদার সাথে শিলিগুড়িতে দেখা করতে গিয়েছি তখন তিনি কিছুটা সেটেলড্। একটি ডাক্তারখানা খুলে দুজনে ব্যবসা চালাচ্ছেন অনেকটা সন্তুষ্টি সহ।

সে বার পুরুষোত্তম আর আমার সাথে কলকাতার ধর্মতলায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল রঞ্জন সাহা স্যারের সাথেও। তিনি আমাদের প্রবলভাবে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অসম্ভব ইমোশোনাল। তার চোখে রীতিমত জল এসে গিয়েছিল আনন্দে। তিনিও বলেছিলেন শুধু মাত্র মায়ের নিত্যদিনের তাড়িত ইচ্ছায় তিনি ওভাবে আমাদের ছেড়ে চুপিসারে পালিয়ে এসেছিলেন। এখন মা ও তিনি ভাল করে বুঝেছেন যা ভেবেছিলেন এ জগৎ তা নয়। এখানে ওরা অপাংতেয়, অবহেলিত 'বাঙ্গাল'। কিন্তু ফেরার পথতো বন্ধ করেই এসেছিলেন তারা– তাই এই লজ্জা ও জ্বালা।

ডঃ মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, ০৫/০৭/২০০৬